মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৫৯ সংখ্যা: ১-২
ফাল্গুন ১৪৩০॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৪
Issue DOI: 10.62328/sp.v59i1-2

DOI: 10.62328/sp.v59i1-2.4
প্রবন্ধ জমাদান: ২০ জানুয়ারি ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ৫ মে ২০২৪
পৃষ্ঠা: ৭৫-৯৬

বিনয় মজুমদারের কবিতা: প্রেম ও নিসর্গের নান্দনিক শিল্পভাষ্য

জোবায়ের আবদুল্লাহ
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: zobayer@du.ac.bd

সারসংক্ষেপ

বিনয় মজুমদার (১৯৩৪-২০০৬) উত্তর-জীবনানন্দ পর্বের এক সত্যসন্ধ কবি যিনি কবিতার বিষয় ও শৈলীতে অভিনব ও স্বতন্ত্র। বস্তুবিশ্ব ও মনোবিশ্বের অনির্বাণ আঘাতে-প্রত্যাঘাতে নির্মিত হয়েছে তাঁর কবিমানস। কবিতায় তিনি প্রদর্শন করেছেন নিবিড় অধ্যবসায় এবং নিরলস পরিশ্রমের স্বাক্ষর। পাঁচ দশকব্যাপী বিস্তৃত বিনয়ের কবিজীবন গ্রহণ-বর্জন-স্বীকরণের নিজস্ব নিয়মে বিকশিত। বিষয়-গৌরব ও প্রকরণ-পরিচর্যায় তাঁর কবিতা বহুকৌণিক ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর। প্রেম ও নিসর্গের নিবিড় অনুধ্যান বিনয়-কাব্যের এক গৌরবময় প্রান্ত। প্রেম-ভাবনায় তিনি ব্যক্তিজীবনের অনুভব ও উপলব্ধিকে দিয়েছেন শিল্পমূল্য। অপরদিকে বিজ্ঞান ও গণিত-মনস্ক বিনয়মানস প্রকৃতি ও নিসর্গলোক থেকে অর্জন করেছে অনিঃশেষ রহস্যের সন্ধান। প্রেম ও নিসর্গ—দুইয়ের শৈল্পিক গ্রন্থনায় বিনয়-কাব্য অর্জন করেছে বিস্ময়কর শিল্পসিদ্ধি। আলোচ্য প্রবন্ধে বিনয় মজুমদারের কবিতায় প্রেম ও নিসর্গের যে নান্দনিক শিল্পভাষ্য তা অন্বেষণের প্রয়াস রয়েছে।

মূলশব্দ

পঞ্চাশের দশকের কবিতা, ভাগ্যবিড়ম্বিত কবিজীবন, আত্মজীবনীমূলক কবিতা, মানব-মানবীর আন্তঃসম্পর্ক, প্রেমজ বিরহ, শরীরনির্ভর প্রেমার্তি, কবিতায় নিসর্গলোক, বিজ্ঞানমনস্ক কবিতা, কাব্যের শিল্পবিন্যাস।

এক

বাংলা কবিতাঙ্গনে বিনয় মজুমদার এক ব্যতিক্রমী শিল্পস্রষ্টা, যিনি নির্মাণ করেছেন স্বতন্ত্র এক কাব্যভুবন। প্রথাগত কাব্যকলার নিরিখে যেমন তাঁর কাব্যবিচার সম্ভব নয়, তেমনি নবতর কাব্য-অভিজ্ঞান প্রকাশেও তিনি নিরন্তর আপসহীন। নির্দিষ্ট কালপর্বের হয়েও স্বকালের কবিদের সঙ্গে তাঁর বিস্তর ব্যবধান। কালের হয়েও কালাতীত ব্যঞ্জনায় শিল্পোত্তীর্ণ তাঁর কাব্যবিশ্ব। বিরল সৃষ্টিপ্রতিভার সমূহ সম্ভাবনা জাগিয়েও অকস্মাৎ নিষ্প্রভ হয়ে যায় বিনয়-প্রতিভার দীপ্তি। দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত বিনয়কে অবলম্বন করতে হয় এক ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবন। এই জীবনকে তাই আপাত অপচয় বলে মনে হতে পারে কিন্তু সেই অপচয়িত জীবন-নির্যাসে যে বিনয়কে পাওয়া যায় সেখানেও তিনি এক অনন্য সত্যদ্রষ্টা, একজন প্রকৃত 'শহিদ কবি'। ব্যক্তিজীবনে নিরন্তর ব্যর্থ বিনয় ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানের উজ্জ্বল ছাত্র, যিনি পরবর্তীকালে প্রকৌশল বিদ্যাবিষয়ে উচ্চশিক্ষায়ও রাখেন কৃতিত্বের স্বাক্ষর। *ফিরে এসো, চাকা* কাব্যের মাধ্যমে বিনয় বাংলা কবিতাঙ্গনে অর্জন করেন চিরস্থায়ী আসন। কিন্তু একটি 'উজ্জ্বল মাছে'র মতো এই একটি উত্থানের পরই তিনি নিমজ্জিত হন প্রগাঢ় ব্যর্থতার গভীর নীলিমায়। প্রেম-পরিবার-চাকরি সর্বত্রই তিনি রচনা করেন বিরামহীন ব্যর্থতার বিধিলিপি। জীবনের কোনো পর্বেই আসেনি সামান্যতম স্থিতির সন্ধান। জ্যোতির্ময় দত্ত জানাচ্ছেন:

> নিতান্ত আক্ষরিক অর্থে তিনি বারংবার প্রহৃত হন; এক কঠিন ব্যাধি তাকে আক্রমণ করে। যদিও এই শিল্পোন্নতিকামী সমাজের কারিগরিবিদ্যা জানা ব্যক্তিদের চাহিদা অপূরণীয়, তবু এক বিনয় মজুমদারকে কোনো প্রতিষ্ঠান দু-এক মাসের বেশি গ্রহণ করেনি। সাংসারিক সফলতার অনেক উপকরণই তাঁর ছিল, আর অন্তরায় ছিল একটিই: তাঁর প্রতিভা। (জ্যোতির্ময় ২০১৭: ২১)

জ্যোতির্ময় দত্তের এই বক্তব্যের প্রতি আস্থাশীল হয়ে বলা যায়, বিপুল প্রতিভা এবং প্রতিকূল জীবনযাত্রা বিনয়ের ট্রাজিক সত্তাকে করে তুলেছে প্রগাঢ়। তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময়ব্যাপী মানসিক অসুস্থতা (মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে বিনয় দুরারোগ্য স্কিট্‌সোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হন), চাকরিজীবনে স্থায়ী হতে না পারা এবং পরিণামে নির্মম অর্থকষ্ট, নমঃশূদ্র পরিচয়জ্ঞানে কবিতাগ্রন্থ প্রকাশে প্রকাশকদের অনীহা, গণিত বিষয়ে বিবিধ আবিষ্কার সত্ত্বেও সামান্যতম স্বীকৃতির সন্ধান না পাওয়া, আমৃত্যু অকৃদার জীবনযাপন কিংবা জীবনময় বন্ধুহীনতা এ সবই বিনয়-জীবনের প্রকৃত ট্রাজেডি। ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতার জন্য বিনয়ের নিজের দায় যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি দায় তাঁর সমাজ ও জীবন-প্রতিবেশের। জীবনের এই বিবিধ ব্যর্থতার সূত্রসন্ধান করে বিনয় ব্যক্ত করেছেন তাঁর খেদের কথা:

> আমি সাতবার পাগলা গারদে থেকেছি, চারবার জেল খেটেছি। এবং একবার দেশত্যাগ করে পালাতে হয়েছে আমাকে। পালিয়ে চলে গিয়েছিলাম পূর্ববঙ্গে। কারণ যেদিন পালালাম তার মাস দুই-তিন আগে আমার বাঁ-চোখ এবং বাঁ-কান নষ্ট করে দেওয়া হয়। চোখ-কান দুই-ই আমার ভালো ছিল। অনেকেই তো পাগলাগারদে ছিলেন। তাঁদের জীবনীতে তা লেখা হয় না। আর আমার জীবনী লিখতে গেলে প্রথম বাক্যেই লেখে—'গোবরা মানসিক

> হাসপাতালে ছিলেন ...' পাগলাগারদে ছিলেন লুম্বিনী পার্কে ... মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘোটক। এঁদের জীবনী যখন লেখে তখন তো এসব কথা এভাবে লেখে না যে এঁরা পাগলাগারদে ছিলেন। অথচ আমার ক্ষেত্রে প্রথমেই ওই কথা 'মানসিক হাসপাতালে ছিলেন।' (বিনয় ২০১৬: ৮০)

কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্য পরিমণ্ডলেও বিনয়তুল্য এমন ভাগ্যবিড়ম্বিত কবিজীবন নিতান্ত বিরল। এ ক্ষেত্রে বিনয় তুলনীয় হতে পারেন উইলিয়াম ব্লেক (১৭৫৭-১৮২৭), শার্ল বোদলেয়ার (১৮২১-১৮৬৭) কিংবা ফিওদোর দস্তয়েভস্কির (১৮২১-১৮৮১) সঙ্গে, যাঁদের শিল্পজীবন বিপুল ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিময় হলেও ব্যক্তিজীবনে তাঁরা বহন করেছেন অনিঃশেষ ব্যর্থতা। বিনয় মূলত জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)-কথিত নবীন নক্ষত্রের নিচে হেঁটে চলা সেই 'গভীরভাবে অচল মানুষ', অজস্র ব্যর্থতার আগুন আলোয় যিনি কেবলই হয়েছেন জ্যোতির্ময়।

পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধে বাংলা কবিতায় বিনয় মজুমদারের আবির্ভাব ঘটলেও প্রকৃত অর্থে ষাটের দশকে তিনি এক অতি আধুনিক কবি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন[১]। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অন্তরালে মনুষ্যচেতনার এক সর্বকালিক ভাষ্য নির্মাণ করে তিনি বাংলা কবিতাকে দেন সমৃদ্ধির যোগান। পঞ্চাশের দশকের প্রতিনিধিস্থানীয় এই কবিব্যক্তিত্বের কবিতা পত্রপত্রিকায় প্রকাশের পূর্বেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। যদিও প্রথম কাব্য *নক্ষত্রের আলোয়* (১৯৫৮) সমসাময়িক কবিতাঙ্গনে তেমন সাড়া জাগতে পারেনি[২]। বিনয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল কাব্যরুচির ব্যাপারে তিনি বেশ প্রাচীনপন্থি। তবে এই অভিযোগ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। *নক্ষত্রের আলোয়* পাঠকপ্রিয়তা অর্জনে ব্যর্থ হলে বিনয় নব-উদ্যমে সর্বান্তঃকরণে কাব্যচর্চায় প্রয়াসী হয়েছেন[৩]। জীবন-জীবিকাকে দূরে ঠেলে কবিতাকেই করে তুলেছেন জীবনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান[৪]। আর এভাবেই নক্ষত্রের আলোর জগৎ অতিক্রম করে বিনয় উত্তীর্ণ হন তাঁর নিজস্ব পরিমণ্ডলে; *গায়ত্রীকে* (১৯৬১), *ফিরে এসো, চাকা* (১৯৬২)-র মতো স্বনির্মিত কাব্যজগতে। বিনয় প্রথম থেকেই তাঁর কালের অন্য সব কবির চেয়ে ছিলেন ভিন্ন পথসন্ধানী। কাব্যক্ষেত্রে বিনয়ের ভিন্ন পথসন্ধানের এই প্রচেষ্টা প্রকটিত হয় তাঁর কাব্যের বিষয়জ্ঞান, ভাষিক স্বাতন্ত্র্য ও ছন্দ নিরীক্ষায়। এ সম্পর্কে একজন সমালোচকের বক্তব্য স্মর্তব্য:

> পাঁচের দশকের প্রধান কবিদের মধ্যে শঙ্খ ঘোষ, আলোক সরকার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় বা উৎপলকুমার বসু—এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের মৌলিক বাচনভঙ্গির জন্য স্মরণীয় হয়ে উঠেছেন। বিনয় মজুমদার তাঁদেরই সহযাত্রী। সহযাত্রী—কিন্তু একই পথের পথিক নন। প্রথম থেকেই বিনয়ের কবিতা অন্য সকলের থেকে আলাদা। পূর্বে যাদের নাম উল্লেখ করা হল, তাঁরা সকলেই নিজের নিজের ধরনে বিশিষ্ট। প্রত্যেককে আলাদা করে চিহ্নিত করতে হয়, ঠিক গোষ্ঠী-নামে তাঁদের কবিব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে না। বিনয় এঁদেরই সমকালীন, একই পারিপার্শ্বিকে বেড়ে উঠেছে তাঁর কল্পনা-প্রতিভা, কিন্তু কোনমতেই অন্যদের সঙ্গে তুলনীয় নন তিনি। (পিনাকেশ ২০১২: ১৫৫)

দুই

বিনয় মজুমদারের কাব্যপ্রতিভার প্রেরণা-উৎস মূলত তাঁর আত্ম-অভিজ্ঞতার জগৎ। এই অভিজ্ঞতা একই সঙ্গে ব্যক্তিক ও বৈশ্বিক। অনুভূতি ও কল্পনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ সত্ত্বেও পারিপার্শ্বিক জীবন-প্রতিবেশ সম্পর্কে বিনয়ের সতর্ক দৃষ্টির প্রতিফলন লক্ষ করা যায় তাঁর কবিতায়। ফলত বিনয়ের কবিতায় যে তথ্যের সমাবেশ ঘটে সেই তথ্যও অর্জন করে ভাষিক শিল্পরূপ। গণিতবিশারদ বিনয়ের কবিতায় গণিতের পাশাপাশি বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারও বিষয়বস্তু হিসেবে গৃহীত হয়েছে[৫]। অগ্রজ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) যে ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে কাব্যের বীজ সংগ্রহের[৬] কথা বলেছেন, বিনয় মজুমদার অনেকটা সচেতনভাবে সে পথেরই সন্ধানী হয়েছেন। বহির্জগতের বিক্ষিপ্ত উপকরণের নিছক সমাবেশ যে কবিতা নয় তা মর্মমূলে অনুভব করে তিনি মনোযোগী হয়েছেন একধরনের সমন্বয়ধর্মী মানস-উপলব্ধির শৈল্পিক গ্রন্থনার দিকে। নিত্যদিনের বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতার একটি পরম উপলব্ধির আলেখ্য রচনাকে যদি কবির কর্তব্য হিসেবে স্বীকার করা হয়, তাহলে পরম সার্থকতায় পরিপার্শ্বের অবিচ্ছিন্ন জীবনের সঙ্গে তিনি প্রবহমান জীবনের সমীকরণ রচনা করে স্বকীয় চৈতন্যের রসায়নে নবচৈতন্যের উদ্ভাসন ঘটিয়েছেন। আত্ম-অভিজ্ঞতার শৈল্পিক রূপায়ণ কাব্য হলেও এই অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করতে হয় ব্যক্তিক বৃত্তবদ্ধতা এবং তাকে যুক্ত হতে হয় পাঠকের অভিজ্ঞতায়। বৈচিত্র্যের প্রয়োজনে কবিকে হতে হয় বিশ্বমুখিতার আশ্রয়ী, কেননা সাধারণ মানুষের জীবনবেদ এত সংকীর্ণ, 'তার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র এত অপরিসর, এমন অনেক অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে সে এ-রকম অশিক্ষিত যে সাহিত্যের কল্যাণে তার অবিদ্যা না কাটলে, সে নিতান্ত নিরুপায়। ফলত কবির পক্ষে শুধু বাস্তবের প্রসাদ বিতরণ যথেষ্ট নয়।' (সুধীন্দ্রনাথ ১৩৬৪: ১৬০)

কবি কাল্পনিক অভিজ্ঞতার উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেও কল্পনার সম্ভাব্য সীমা তাঁর জন্য অনতিক্রম্য। কবিতার বিষয় নির্বাচনের প্রসঙ্গে বিনয়কে তাই ভাবতে হয়েছে অনেক বেশি। একজন সৎ কবির মতো কাব্যের নতুন সূত্রসন্ধানে তিনি মগ্ন দৃষ্টি রেখেছেন পারিপার্শ্বিক জগৎ এবং সেই জগতের বিস্তৃত বস্তুরাশিতে। বিনয়ের বক্তব্যে পাওয়া যায় এর সত্যতা:

> সৃষ্টির মূল যে সূত্রগুলি তা জড়ের মধ্যে প্রকাশিত, উদ্ভিদের মধ্যে প্রকাশিত, মানুষের মধ্যেও প্রকাশিত। এদের ভিতরে সূত্রগুলি পৃথক নয়, একই সূত্রে তিনের ভিতরে বিদ্যমান। এই সার সত্য সম্বল ক'রে ভেবে দেখলাম জড়ের জীবনে যা সত্য, মানুষের জীবনেও তাই সত্য, উদ্ভিদের জীবনে যা সত্য, মানুষের জীবনেও তাই সত্য। অতএব জড় এবং উদ্ভিদের জীবন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করতে লাগলাম আমি। এবং তাদের জীবনের ঘটনাকে মানুষের জীবনের ঘটনা ব'লেই চালাতে লাগলাম। এইভাবে শুরু হলো কবিতার জগতে আমার পথযাত্রা, আমার নিজস্বতা। এইভাবে সৃষ্টি হলো 'গায়ত্রীকে', 'ফিরে এসো, চাকা'। (বিনয় ২০১৭: ২০)

কবিতায় বিষয়ের সঙ্গে প্রকরণের নিবিড় যোগ জরুরি—এই বিশ্বাসে বিনয় ছিলেন আস্থাশীল। তিনি যে কাব্যচর্চায় মাঝে মাঝেই বিরতি দিয়েছেন তারও বড় কারণ বিষয়বস্তুর অভাব।

যখনই তিনি কথাবস্তুর সন্ধান পেয়েছেন তখনই কাব্যরচনায় করেছেন অখণ্ড মনোনিবেশ। বিনয়ের কবিতার বিষয় মাত্রাবহুল হলেও দর্শনাশ্রিত এক নব-প্রেমচেতনার প্রকাশ তাঁর কবিতার ভরকেন্দ্র। প্রকৃতি ও মনুষ্যজগতের আন্তঃসম্পর্কের শৈল্পিক বিন্যাসেও তিনি বাংলা ভাষার অন্য সকল কবি থেকে স্বতন্ত্র। বিনয়ের কাব্যভুবন সম্পর্কে বিজয় সিংহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন:

> বিনয় মজুমদার, জীবনানন্দের কনিষ্ঠ সন্তান, রচনা করতে চেয়েছেন একটি ভূমধ্য পৃথিবী। সে পৃথিবীতে পবিত্র নাগরিক হয়ে ওঠে বৃক্ষ, সমুদ্র, অরণ্য, পুষ্পপুঞ্জ, প্রকৃত সারস, উজ্জ্বল মাছ, গাঙচিল, ফড়িং, অমল প্রত্যুষ, ঝিঁঝি পোকাদের রব, প্রকৃত লিপ্সার মতো ঋজু হয়ে ওঠা পাইন, নীলাভ হওয়া অনেক আকাশ, শাশ্বত পানীয় জল, দীর্ঘ রজনীগন্ধা, সরল বকুল, নিষিদ্ধ সমুদ্র স্নান, বেলাভূমি; রাত্রির শিশির, উপত্যকা, 'গীতিময় আমি' আর শাশ্বত মাছের মতো বিস্মরণশীলা 'তুমি'—'সব মিলে একটি বিশাল জীবন' গড়ে ওঠে। (বিজয় ২০২১: ১০৯)

সদ্যস্বাধীন ভারতভূমিতে পঞ্চাশের দশকের অন্য সকল বাঙালি কবি যেমন তাঁদের আত্মজীবনী-নির্ভর কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেছেন, বিনয়ের ক্ষেত্রেও এর বিশেষ ব্যতিক্রম হয়নি[৭]। তবে বিনয়ের কবিতায় আত্মজীবনের উন্মোচন-সূত্রে আভাসিত হয়েছে বিশ্বময় বিস্তৃত বিশাল জীবনের কথা। কারণ জগদ্বিচ্ছিন্ন আত্মজীবনের পরিবর্তে পরিপার্শ্বের রূপ-রস-গন্ধসমৃদ্ধ সম্পূর্ণ জীবনই বিনয়ের নিকট অধিকতর মূল্যবান। বিনয়-কাব্যপরিক্রমা পর্যালোচনা করলে তাঁর কাব্যের যে সূত্রসমূহের সন্ধান পাওয়া যায় তা হলো:

ক. কাব্যজীবনের প্রাথমিক পর্বে বিনয় মজুমদার ছিলেন আবেগচালিত। *নক্ষত্রের আলোয়* কাব্যে প্রণয়াবেগের মতো হৃদয়ভিত্তিক প্রসঙ্গ তাঁকে অবিরাম উদ্বেলিত করেছে। কাব্যটিতে কবি যতটা যুক্তিচালিত ও মনন-শাসিত তার চেয়ে অনেক বেশি হৃদয়ভিত্তিক আলোড়নে হয়েছেন আন্দোলিত।

খ. কাব্যজীবনের দ্বিতীয় পর্বে কবি ব্যক্তিগত প্রেমবোধ ও শিল্পবোধকে ওই অভিন্ন সূত্রে গ্রন্থিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এ পর্বে রচিত *ফিরে এসো, চাকা* এবং *অধিকন্তু* কাব্যে ব্যক্তিবেদনা নৈর্ব্যক্তিকতায় সমর্পিত হয়েছে।

গ. তৃতীয় পর্বে রচিত *অঘ্রানের অনুভূতিমালায়* কবি ঘটনার বিবৃতিধর্মী কাব্যপ্রয়াসের পরিবর্তে গ্রহণ করেছেন প্রকৃতিলোকের বর্ণনাত্মক উপস্থাপন-কৌশল।

ঘ. চতুর্থ পর্বে রয়েছে বিনয়ের বহুল আলোচিত এবং বহুবিতর্কিত কাব্য-অধ্যায়। এ পর্বে রচিত *ঈশ্বরীর* এবং *বাল্মীকির কবিতা* প্রভৃতি কাব্যসমূহে বিনয় হয়ে উঠেছেন অনেক বেশি দেহমুখী।

ঙ. কাব্যজীবনের শেষ পর্বে বিনয়ের কবিতার শৈল্পিক মান অক্ষুণ্ণ থাকেনি। অসুস্থ ও ভাগ্যবিড়ম্বিত কবি অগ্রসর হয়েছেন সরল ও বর্ণনাত্মক রচনারীতির দিকে। এ পর্বে তাঁর কবিভাষা নিরলংকার শব্দমালায় নির্মিত। বহমান জীবনের নিত্যতার সত্যকে

প্রতিষ্ঠা করতেই যেন তিনি অনেক বেশি আন্তরিক। *আমাদের বাগানে, আমি এই সভায়, এক পংক্তির কবিতা, আমাকেও মনে রেখো, আমিই গণিতে শূন্য, এখন দ্বিতীয় শৈশবে, কবিতা বুঝিনি আমি, হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ* নিয়ে গঠিত বিনয়কাব্যের এ পর্বটি পরিমাণগত বিচারে অধিক হলেও শিল্পোৎকর্ষের বিচারে তা শেষ পর্যন্ত মলিনতায় পর্যবসিত।

তিন

তিরিশোত্তর কালের কবিদের হাত ধরে বাংলা কাব্যে প্রণয়-প্রসঙ্গ নবতর ব্যঞ্জনা লাভ করে। আধুনিক জীবনবোধ ও নগরকেন্দ্রিক জীবনপ্রতিবেশ-সূত্রে তাঁদের কাব্যে লক্ষ করা যায় প্রেমের নবতর সংজ্ঞায়নের প্রয়াস। বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য-কবিতায় প্রেমের যে প্রকাশ, তা বাংলা কবিতায় একরকম অভিনব সংযোজন। কবিতায় প্রেম রূপায়ণের এই গতিধারা চলমান থাকে *কল্লোল* থেকে *কৃত্তিবাস* পর্যন্ত। পঞ্চাশের দশকে কাব্যক্ষেত্রে বিনয় মজুমদারের আবির্ভাব এই ধারাকেই সম্প্রসারিত করে। দর্শনাশ্রিত চিন্তা-চেতনা, আবেগের ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ এবং গণিতাশ্রয়ী অলংকারের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে বিনয়ের কবিতা স্বতন্ত্র মাত্রা অর্জন করলেও তাঁর কাব্যচর্চার মূল প্রেরণাশক্তি ছিল প্রেম। বিনয় মূলত 'প্রেমেরই কবি' (মাসুদুজ্জামান ১৯৯৩: ১৫৭)। *নক্ষত্রের আলোয়* কাব্যের মাধ্যমে সে প্রেমের প্রতিধ্বনি প্রথম শোনা যায়। পরবর্তী পর্যায়ে *ফিরে এসো, চাকা, অঘ্রানের অনুভূতিমালা, ঈশ্বরীর* প্রভৃতি কাব্যে প্রেমের অত্যুজ্জ্বল উদ্ভাস লক্ষিত হয়। *ঈশ্বরীর* থেকে কবি যতোই *বাল্মীকির কবিতার* দিকে অগ্রসর হয়েছেন ততই তাঁর প্রেম হয়ে পড়েছে শরীর-সংলগ্ন। শেষ পর্বে রচিত *আমাদের বাগান, আমি এ সভায়, আমাকেও মনে রেখো, আমিই গণিতের শূন্য, এখন দ্বিতীয় শৈশবে, কবিতা বুঝিনি আমি, হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ*— এসব কাব্যে তিনি প্রেমের শরীরী রূপ পরিহার করতে সক্ষম হয়েছেন।

নক্ষত্রের আলোয় প্রকাশকালে কবির কর্মজীবন ও শিল্পীজীবনে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস আছে কিন্তু সে প্রতিষ্ঠা তখনও আসেনি। কাব্যটির শিল্প-উৎকর্ষের অভাবও কবিকে পীড়িত করেছে। কাব্যটিতে জীবনানন্দের প্রভাবও সহজেই অনুমেয়। *নক্ষত্রের আলোয়* কাব্যে কবির কল্পনাবিলাস আছে; একই সঙ্গে আছে কল্পনাবিলাসী প্রেমের উচ্চারণ। কবির প্রেয়সী এখানে কোনো রক্তমাংসের মানবী হিসেবে চিহ্নিত হয়নি, তার উপস্থিতি যেন 'আকাশের সুনীল অতলে'—যাকে জীবনের দৈনন্দিনতায় পাওয়া যায় না। শিল্পযাত্রার সূচনাপর্বে এক প্রকার অপ্রাপ্তিজনিত বোধ কবির মধ্যে দ্বিধা ও সংশয়ের জন্ম দিয়েছে। এ পর্বে কবি যাত্রা করেছেন 'রূঢ় ভিড়ের মধ্যে' যেখানে 'নির্মম বিষয়ী উৎপাতে' দীর্ঘ গুরুপাকে হৃদয় ক্লান্ত। প্রিয়তমার সঙ্গে তখনও কবির সাক্ষাৎ ঘটেনি কিন্তু কবির আকাঙ্ক্ষা—'তাকেই চাই আমি অবাক প্রাণে প্রাণে'। আবার প্রিয়তমার সঙ্গে আসন্ন মিলন-মুহূর্তের কথা ভেবেও কবি বিচলিত হয়েছেন এক অজানা আতঙ্কে। কিছুটা কৈশোরিক আবেগময় উচ্চারণও এ পর্যায়ে কবিকণ্ঠে লক্ষ করা যায়: 'আমি তো চাঁদ নই, পারি না আলো দিতে/ পারি না জলধিকে আকাশে তুলতে।/ পাখির কাকলির আকুল আকুতিতে/ পারবো কি তোমার পাপড়ি খুলতে? ('উন্মোচনের গান')। অজ্ঞাত এবং অপরিচিত এই নারী, যিনি কবির জীবনে যুক্ত করেছেন অনিঃশেষ রহস্য। দূরাগত এই

নারীর সন্নিকটবর্তী হয়ে কবির অভিজ্ঞতা সুখকর হয়নি। তার আগমনে কবিহৃদয় প্রশান্তির পরিবর্তে বেদনায় হয়ে পড়েছে শীতকাতর ও আড়ষ্ট। জীবনের সকল অবসাদ ও পুঞ্জীভূত ব্যর্থতার গ্লানি কবিকে করেছে আরো বেশি ব্যথিত ও মর্মাহত। ক্ষণিকের প্রেম-সান্নিধ্য 'চিরদিন একাএকা' পথচলা কবির অন্তর্গত একাকিত্বের বেদনাকেই বরং প্রগাঢ় করেছে:

দূরাগতা, ভুল বুঝোনাকো।
তুমি যদি পাশে ব'সে থাকো,
মনে নেমে আসে তবে জীবনের সব ব্যর্থতা,
সব গ্লানি, সব অপরাধ;
নিজের অতীত নিয়ে কেন যেন মনে মনে খেলি, দূরাগতা।
তুমি যেন চ'লে যাও অতি দূর, অমলিন নক্ষত্রের নীলে;
আমি যেন ধীর হিম, বিশাল প্রান্তরে ব'সে ব'সে
সমুদ্রের কথা ভাবি, অনুভব করি তুমি কতো কাছে ছিলে! ('চিরদিন একাএকা', *নক্ষত্রের আলোয়*)

নশ্বর পৃথিবীর সবকিছু ক্ষণিকের কালসীমা দ্বারা বেষ্টিত—এই উপলব্ধি কবির নিজস্ব দর্শনজাত। পৃথিবীর সমস্ত বস্তুরাশির মতো প্রিয়তমার রূপ-লাবণ্যও যে ক্ষণিকের—কবি অনুধাবন করেছেন সেই অন্তর্সত্য। এ কারণে কখনো কখনো প্রেমবঞ্চিত কবির সাধ জাগে নধর জলের নিচে সেই নারীর ক্ষণিক রূপের অবসান প্রত্যক্ষ করার। প্রেমধর্মে যে নারী আজ কবি থেকে দূরবর্তী, কালধর্মে সে রূপ-লাবণ্য হারিয়ে এখন বিগতযৌবনা। এমনকি সেই রূপের অবশিষ্টাংশও যখন আর বর্তমান নেই, তখন কবি সেই শ্রীহীন নারীর মুখোমুখি হবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন:

কোন্ কালে হয়ে গেছে বুড়ি;
কোন্ কালে তার সব রূপ গেছে পচে;
হয়তো বা তার আর নেই কোনো লেশ।
সাধ জাগে, বড়ো সাধ জাগে—
ডুব দিয়ে দেখে আসি নধর জলের নিচে
এখনো রয়েছে কিনা কোনো অবশেষ। ('কুঁড়ি', *নক্ষত্রের আলোয়*)

নক্ষত্রের আলোতে এসেছেন কবি কিন্তু নিঃসঙ্গ হৃদয়ের ভারকে অতিক্রম করতে পারেননি। ফলত জ্যোৎস্নার অমলিন আলোর অনুপস্থিতিকে কবি দেখেছেন বিপন্নতা ও বিমর্ষতার প্রতীকে। বাস্তবের চেনা জগতে ব্যক্তিহৃদয় যখন কেবলই প্রত্যাশা ভঙ্গের যন্ত্রণায় ব্যথিত ও বেদনার্ত হয়, তখন রূপকথার জগতে কবি মানব-মানবীর আন্তঃসম্পর্কের সূত্রে সন্ধান করেন প্রেম-সত্যের নির্যাস। রূপকথার জগতে যখন উষার আলোকে রাজকুমার দাঁড়ায় রাজকুমারীর পালঙ্ক-পাশে, তখন পৃথিবীর সকল স্বপ্ন প্রতিফলিত হয় সেই রাজকুমারীর মুখে। কবি প্রেমের সুখ এবং তার যন্ত্রণাকে সমান্তরালে রেখে প্রেমের স্বরূপ উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছেন:

রূপকথা শুনেছি সে—কঙ্কাবতী, পদ্মমালা, শঙ্খিনীমালার।
মনে হয় সব ব্যথা—সব সুখ পেয়ে গেছি—পেয়েছি সকলই। ('কতো রূপকথা', *নক্ষত্রের আলোয়*)

কবির বিশ্বাস ‘তারই তো কাছে আলো!’ তবু তিনি কোনো অজানা কারণে বধির আঁধারে খুঁজেছেন আলোর নিশানা। ‘অথচ সে আলো নয়/ আলোকের উদ্ভাসন নয়’, কবির কাছে সেই নারী আবিষ্কৃত হয়েছে এক পরম বিস্ময়রূপে:

> তোমার দিকে তাকাই আমি, কী যে রহস্যের
> অতল এক সমুদ্রের গভীর উদ্ভাস
> তোমার চোখে, শরীরে, মনে অজ্ঞতার জের
> হয়তো দেবে ব্যর্থ করে সমুদ্রের শ্বাস।’ (‘তোমার দিকে’, *নক্ষত্রের আলোয়*)

বহতা সময়ের হাত ধরে কবির আকাঙ্ক্ষাগুলো পরিতৃপ্তির সন্ধান পায় না। পিপাসু সূর্যসম নির্মেঘ আকাশের অগাধ তৃষ্ণায় কবি প্রত্যক্ষ করেন বৃষ্টি ও বাষ্পপুঞ্জহীন অনুর্বর পৃথিবীকে; যেখানে সাবলীল নৃত্য নেই, নেই জীবনের কোনো উচ্ছ্বাস। প্রকট কামনায় শরীর যখন শীর্ণ আর প্রগাঢ় বেদনায় হৃদয় যখন নীল হয়ে আসে, তখন কবিকণ্ঠে ব্যক্ত হয় এই আশাবাদ:

> হয়তো এই আকাঙ্ক্ষার বিলুপ্তির পর
> কোনো বিধুর সায়াহ্নের সকাশে চঞ্চল
> সাগর তার দেহের ভার নামাবে ঝরঝর,
> তখন এই মাটিতে নেই অবাক কোলাহল! (‘এই আকাঙ্ক্ষা’, *নক্ষত্রের আলোয়*)

নর-নারীর প্রেম-সম্পর্কে যখন বেদনা-বিচ্ছেদ নেমে আসে, হাহাকারই যখন নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়, তখন দীর্ঘ প্রণয়-সম্পর্ক পরিণতি পায় সংক্ষিপ্ত কাহিনিতে। মানব-মানবীর প্রেম-সম্পর্কের এই পরিণতি লক্ষ করে কবি প্রেম এবং তজ্জনিত বিচ্ছেদ-বেদনা ভুলে থাকতে চান। বিচ্ছেদবিধুর গান থেকে পরিত্রাণের পথসন্ধানে নিমগ্ন কবি উচ্চারণ করেন:

> আর শোনায়োনা সুন্দরী, তুমি সিংহলের ঐ বিষাদবিধুর গান
> কোরো না আহত হৃদয়কে উন্মূল
> গানে মনে পড়ে আরেক জীবন, দূর এক উপকূল ... (‘আর শোনায়োনা’, *নক্ষত্রের আলোয়*)

জীবনানন্দের ‘হায় চিল’ কবিতায় বেদনাবোধ যেন সমীকৃত হয়েছে কবিতাটিতে। *নক্ষত্রের আলোয়* কাব্যে মূলত জীবনানন্দীয় বেদনা বোধেরই সম্প্রসারণ ঘটেছে। তবে পরবর্তী কাব্য *ফিরে এসো, চাকায়* প্রেম-সম্পর্কিত উচ্চারণে কবি স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছেন। একই সঙ্গে কবির স্বকীয় জীবনদৃষ্টি ও প্রতিভার সংস্পর্শও কাব্যটির একটি বিশিষ্ট দিক।

বিনয়ের বহুলালোচিত এবং অনেকের মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য *ফিরে এসো, চাকা*। কাব্যটির প্রথম সংস্করণের নাম *গায়ত্রীকে* (১৯৬১), *গায়ত্রীকের* পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ *ফিরে এসো, চাকা* (১৯৬২)। *গায়ত্রীকের* তৃতীয় সংস্করণ *আমার ঈশ্বরীকে* (১৯৬৪), *ফিরে এসো, চাকা* স্বনামে পুনর্বার প্রকাশিত হয় ১৯৭০-এ। এ কাব্যের নামকরণ এবং কাব্যবিষয় প্রসঙ্গে এক নারীর নাম বিশেষভাবে উচ্চারিত হয় যিনি পরবর্তীকালে পরিচিত হয়েছেন জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যতাত্ত্বিক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক হিসেবে। প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষার্থী থাকাকালে বিনয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল গায়ত্রী চক্রবর্তীর। মূলত তাঁর অনুপস্থিতিই কবিকে প্রাণিত

করেছে এই কাব্য রচনায়[৮]। গায়ত্রী সম্পর্কে বিনয় বিভিন্ন সময় যে বক্তব্য প্রদান করেছেন তার মর্মার্থ এরূপ: গায়ত্রী ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের নামকরা সুন্দরী ছাত্রী। কবির সঙ্গে তাঁর তিন-চার দিনের আলাপ। এরপর তিনি আমেরিকা না কোথায় চলে যান সে বিষয়ে কবি তেমন কিছু জানেন না। *ফিরে এসো, চাকার* নামকরণ প্রসঙ্গে বিনয় জানিয়েছেন গায়ত্রী চক্রবর্তীকেই তিনি চাকা বানিয়েছেন। *ফিরে এসো, চাকার* মুখ্য বিষয় প্রেম হলেও এ গ্রন্থভুক্ত কবিতাসমূহে আবেগার্দ্র জলীয়তা তেমন নেই। বরং 'একধরনের যুক্তি-পরম্পরায় অন্বিত এর রচনারীতি বাংলা কবিতায় বিরল বললেই চলে।' (পিনাকেশ ২০১২: ১৫৫)

ফিরে এসো, চাকায় যে প্রেম ব্যাখ্যাত হয়েছে তা মূলত 'প্রত্যাখ্যাত প্রেম'। এ কাব্যে বিধৃত প্রেমপ্রসঙ্গে একজন কবি-সমালোচক অনেকটা সমধর্মী মন্তব্য করেছেন:

> অপ্রাপণীয়ের প্রতি ভালোবাসা যাকে সমাজ স্বীকার করতে চায় না—এমনকি কখনো কখনো অবৈধ বলেও অভিহিত করে—তেমন সব প্রেম-সম্পর্ক নিয়ে যুগে যুগে চিরন্তন সাহিত্য রচিত হয়েছে। বন্দিত হয়েছে। *ফিরে এসো, চাকা*-ও অপ্রাপণীয়কে ভালোবাসার কাব্য। (জয় ২০২১: ১১৯)

কাব্যগুণ ও অভিনবত্বের বিচারে *ফিরে এসো, চাকা* কেবল বিনয়-কাব্যের উৎকৃষ্টতম ফসল নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম স্মারক। প্রেম-প্রত্যাখ্যাত বাঙালি কবির অভাব নেই, কিন্তু সেই প্রত্যাখ্যানের 'অসহ ধিক্কারে আত্মলীন' হয়ে *ফিরে এসো, চাকায়* যে কাব্য-পাটাতন নির্মিত হয়েছে তা 'যেন মহাকাশ থেকে পড়া—বাংলা কবিতার ইতিহাসে প্রক্ষিপ্ত—একটি উল্কাখণ্ড।' (জ্যোতির্ময় ২০১৭: ৫১)

ফিরে এসো, চাকা কাব্যের প্রথম কবিতায় একটি 'উজ্জ্বল মাছ' একবার উড়ে আবার ডুবে যাওয়ার স্তিমিত দৃশ্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় কবির বেদনাবোধ পরিণতি পায় 'আপক্ক রক্তিম' ফলে। বিপন্ন মরালের সঙ্গে বিজড়িত হয় কবিপ্রাণের বিপন্ন অস্তিত্বের কথা। 'সমস্ত জলীয় গান বাষ্পীভূত হয়' কিন্তু কবি-হৃদয়ে জেগে থাকে সমুদ্রমৎস্য-তুল্য সেই নারীর কথা, যার প্রতীক্ষায় দীর্ঘ ক্লান্তশ্বাসে আলোড়িত হয় 'পৃথিবীর পল্লবিত ব্যাপ্ত বনস্থলী' আর মিলনের শ্বাসরোধী বক্তব্য যেন পুনর্ব্যক্ত হয় বৃক্ষ ও পুষ্পকুঞ্জের মধ্যকার অলঙ্ঘনীয় দূরত্বে। কবি ব্যক্তিপ্রেমের ভাষ্য নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন সত্য; কিন্তু কবির নৈর্ব্যক্তিক কাব্যগুণে তা রূপান্তরিত হয় মানুষের সর্বকালিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির ব্যবধানসূত্র উন্মোচনে:

> সুস্থ মৃত্তিকার চেয়ে সমুদ্রেরা কতো বেশি বিপদসঙ্কুল
> তারো বেশি বিপদের নীলিমায় প্রক্ষালিত বিভিন্ন আকাশে,
> এ-সত্য জেনেও তবু আমরা তো সাগরে আকাশে
> সঞ্চারিত হ'তে চাই, চিরকাল হ'তে অভিলাষী,
> সকল প্রকার জ্বরে মাথা ধোয়া আমাদের ভালো লাগে ব'লে।
> তবুও কেন যে আজো, হায় হাসি, হায় দেবদারু।
> মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়! (২, *ফিরে এসো, চাকা*)

প্রকৃত সারস-সন্ধানী কবির জীবন-কাব্যের ইতিহাস প্রকৃত অর্থে বিচ্ছেদ ও বিরহের ইতিহাস। কবির সেই আকাঙ্ক্ষিত মানসপ্রতিমা কেবল অপ্রাপণীয় হয়ে কবির মর্মলোকেই থেকেছে; বাস্তবের চেনা জগতে কখনো ধরা দেয়নি। এ পর্বে কবির উচ্চারণ এতটাই হৃদয়ঘনিষ্ঠ যে খুব সহজেই তাতে আবিষ্কৃত হয় তাঁর মর্মান্তিক জীবনযন্ত্রণার পাঠ। জীবনের ক্লান্তি ও অবসন্নতায় নিরুপায় কবি গভীর হতাশার সঙ্গে লক্ষ করেছেন জীবনময় 'অন্ধকার আকাশের বিস্তার'। চিরকাল 'সফল জ্যোৎস্না'র বাসনাবিলাসী বিনয়ের কাছে 'জীবনধারণ করা মানে সমীরবিলাসী হওয়া নয়'। 'আত্মঘৃণা' ও 'ধিক্কারে' নিমজ্জিত কবিহৃদয়ে তাই সঞ্চারিত হয় বেদনার গাঢ় নির্যাস। জীবনের প্রতিটি ব্যর্থতা ও ক্লান্তি কবিকে নিরত রাখে মানব-মানবীর নির্ভুল সম্পর্ক স্থাপনের পথে। 'সময়ের সঙ্গে বাজি ধরে পরাস্ত' কবির কাছে 'ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায়' অস্তিত্বহীনা সেই নারীকে তাই 'দৃষ্টিবিভ্রমের মতো কাল্পনিক' মনে হয়। লৌকিক প্রয়োজনে সেই নারীকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি জানিয়ে পরক্ষণেই কবি উপলব্ধি করেন একটি ব্যর্থ প্রেমও কীভাবে আশ্চর্য দ্যুতিময় হয়ে ওঠে:

> যদিও অগ্নির মতো জ্বললেই, প্রিয় অন্ধকার,
> বহু দূরে স'রে গেছো; অবশেষে দেখি, প্রেম নয়,
> প'ড়ে আছে পৃথিবীর অবক্ষয়ী সহনশীলতা।
> নিষ্পেষণে ক্রমে-ক্রমে অঙ্গারের মতোন সংযমে
> হীরকের জন্ম হয়, দ্যুতিময়, আত্মসমাহিত। (১৭, *ফিরে এসো, চাকা*)

'পৃথিবীর অবক্ষয়ী সহনশীলতা'কে মর্মমূলে ধারণ করেন কবি। ব্যর্থপ্রেমে দগ্ধ কবি অঙ্গারসম সংযমে হীরকতুল্য জন্মলাভ করে হয়ে ওঠেন দ্যুতিময়। প্লাবনের মতো যে নারীর আগমন ঘটেছিল কবির জীবনে, এখন তারই অনুপস্থিতিতে কবিকে যাপন করতে হয় শিরীষের ফলের মতো বিশুষ্ক জীবন। তার প্রতীক্ষায় একাগ্রচিত্ত কবির সম্মুখে আকাশের সুদূরতা ছাড়া ভিন্ন কোনো দৃশ্যের জন্ম হয় না। 'অগণন কুসুমের দেশে/ নীল বা নীলাভবর্ণ গোলাপের অভাবের মতো' কবি অনুভব করেন সেই নারীর অভাব: 'নিজের চুলের মৃদু ঘ্রাণের মতো' 'তোমাকেও/ হয়তো পাই না আমি'। অভিজ্ঞতার ক্রমযাত্রায় কবির উপলব্ধি হয় 'তরঙ্গের মতো লুপ্ত, অবলুপ্ত তুমি, মনোলীনা', 'শাশ্বত মাছের মতো' সে যেন বিস্মরণশীলা। আশ্চর্য দীপ্তিময়ী এই নারীর প্রসঙ্গ উচ্চারিত হলে কবি হয়ে ওঠেন বিদেশি ভাষায় কথা বলার মতো সাবধানী। কিন্তু সেই মুখের স্নিগ্ধশ্রী অন্তর-আলেখ্যে ধরা দেয় না। ফলত কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়:

> প্রত্যাখ্যাত প্রেম আজ অসহ ধিক্কারে আত্মলীন।
> অগ্নি উদ্গমন ক'রে এ-গহ্বর ধীরে-ধীরে তার
> চারিপাশে বর্তমান পর্বতের প্রাচীর তুলেছে। (৩১, *ফিরে এসো, চাকা*)

প্রেম-সম্পর্কের অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্বের দোলাচল কবিচিত্তকে ব্যথিত ও বেদনাদীর্ণ করেছে। কবি সন্ধান করেছেন 'কেন এই অবিশ্বাস, কেন আলোকিত অভিনয়', কিন্তু তার উত্তর মেলেনি। এই নারীর জন্যে কবিমনে 'দীর্ঘ আলোড়ন আছে,/ অনাদি বেদনা আছে, অক্ষত চর্মের অন্তরালে/ আহত মাংসের মতো গোপন বা গোপনীয় হ'য়ে'। সমাদর নেই জেনেও পরিতাপহীন হৃদয়ে কবি এই নারীর সন্নিকটবর্তী হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেন। কবিতায় ধ্বনিত হয় এই ব্যর্থপ্রেমের স্বীকৃতি:

আমাকে ডাকে না কেউ নিরলস প্রেমের বিস্তারে।
পুনরায় প্রতারিত; কাগজের কুসুমকলিকে
ফোটাতে পারিনি আমি, অথবা সে মৃতদেহ নাকি! (৪২, *ফিরে এসো, চাকা*)

অভিজ্ঞতার ক্রমযাত্রায় এ পর্বে কবি অনেক বেশি আত্মসচেতন। ফলত কারো প্রতি অবলোকনের প্রয়োজনীয়তা যেমন তিনি অনুভব করেন না তেমনি কালধর্মে কে কোথায় নিভে গেছে তার গুপ্ত কাহিনি সন্ধানেও তিনি অনাগ্রহী। কবিতার পঙ্ক্তির মতো সামান্যতম ভালোবাসাও যখন আর অবশিষ্ট থাকে না, তখন কবি উপলব্ধি করেন একাকীত্বের প্রগাঢ় বেদনা। সে বেদনা কবিকে করেছে ব্যক্তিত্ববান। কিন্তু অন্তর্গত হতাশা ও দগ্ধহৃদয়ের ভারকে কবি যেন কোনোভাবেই অতিক্রম করতে পারেননি:

এত অসহায় আমি, মানবিক শক্তিহীন, তবু
নিমন্ত্রণ পত্র পাই, প্রেরিকার ঠিকানাবিহীন।
এত নিরুপায় আমি, বিষণ্ন বাতাস দিয়ে ঢাকি
অন্যের অপ্রেম, ক্ষুধা, দস্যুবৃত্তি, পরিচিত কাঁটা। (৫২, *ফিরে এসো, চাকা*)

একদিকে প্রবল প্রেমাকাঙ্ক্ষায় আন্দোলিত, অন্যদিকে প্রার্থিত প্রেমের অপ্রাপ্তিজনিত বোধে কবিহৃদয় যন্ত্রণাবিদ্ধ। সময়-পরিক্রমায় বয়সের ভারে যখন দৃষ্টিশক্তিও ক্রমলুপ্ত, তখন ‘কুৎসাভীত বহু ভালোবাসা’ দেখে ম্রিয়মাণ কবিমন হয়ে পড়ে বেদনা-বিহ্বল। সুদীর্ঘ কণ্টকাকীর্ণ পথযাত্রা শেষে কবি আশ্রয় প্রত্যাশা করেন শান্তিময় প্রেমে:

হেঁটেছি সুদীর্ঘ পথ; শুধু কাঁটা, রক্তাক্ত দু-পায়
তোমার দুয়ারে এসে অনিশ্চিত, নির্বাক, চিন্তিত।
তুমি কি আমাকে বক্ষে স্থান দিতে সক্ষম, মুকুর? (৫৬, *ফিরে এসো, চাকা*)

বেদনা-বিহ্বল প্রেমিক কবির কাছে বাতাস যেন আবেগের মথিত প্রতীক, জ্যোৎস্নালোক যেন হৃদয়ের দ্যুতি যা থেকে নিয়ত বিচ্ছুরিত হয় প্রেম। মেঘের শরীরে কবি দেখেন কামনার বাষ্পপুঞ্জ, আর সাগর, কুসুম কিংবা অঙ্গুরীয়ের মাঝে কবি আবিষ্কার করেন প্রেয়সীর মুখচ্ছবি। ‘তোমাকে সর্বত্র দেখি; প্রাকৃতিক সকল কিছুই/ টীকা ও টিপ্পনী মাত্র’। কবি লক্ষ করেন মানুষের অন্তহীন প্রেমতৃষ্ণা মানবজীবনে পরিতৃপ্তির সন্ধান দিতে সক্ষম নয়। কেননা প্রেম সেই সমুদ্রজল যা পানে পরিতৃপ্তির পরিবর্তে কেবলই তৃষ্ণার বিস্তার ঘটে। বৃষ্টির পর আবার যেমন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বায়ু তেমনি মানবজীবনেও প্রেমতৃষ্ণা অনিঃশেষ। প্রেমের এই নবতর অভিজ্ঞান অভিজ্ঞতাঋদ্ধ কবিকে করেছে প্রজ্ঞাবান:

প্রেম, রাত্রি পরিপূর্ণ অতৃপ্তির ক্ষণিক ক্ষান্তিতে।
সেহেতু তুমি তো, নারী, বেজে ওঠো শ্বেত অবকাশে;
এতটা বয়সে ক্ষত—ক্ষত হয়নি কি কোনোকালে? (৫৮, *ফিরে এসো, চাকা*)

কোনো সফলতা নয় বরং আকাশের কৃপাপ্রার্থী তরুর মতো কবিও প্রেমের জন্য প্রতীক্ষারত। যদিও মদিরার বুদ্বুদের মতো যে মিলিয়ে গেছে সিন্ধুপারে, তবুও তারই জন্যে কবি যাপন

করেন প্রতীক্ষার দীর্ঘপ্রহর। আর শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, 'অভিভূত প্রত্যাশায় এরূপ বিরহব্যথা ভালো'। প্রেমের ক্ষণিকতা ও অবিশ্বস্ততা কবিকে প্রেম ও তার পরিণাম সম্পর্কে ব্যথিত ও সংক্ষুব্ধ করে। সকল আত্মনিবেদন কেবলই অন্তঃসারশূন্যতায় পর্যবসিত হবে—এ সত্য যখন কবির কাছে সূর্যালোকের মতো দীপ্তিমান হয় তখন কবি অবতারণা করেন সেই মৌলিক প্রশ্নের, 'ভালোবাসা দিতে পারি, তোমরা কি গ্রহণে সক্ষম?' প্রেম সম্পর্কিত এমন ব্যক্তিত্বময় উচ্চারণ বাংলা কবিতায় তুলনাবিরল। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রথাগত প্রেমে আস্থা হারিয়ে নিখিল নাস্তির গর্ভে নিমজ্জিত হয়েছেন, বিষ্ণু দে অধুনা প্রেমের চাতুর্য সম্পর্কে হয়েছেন সজ্ঞান-সচেতন। আর বিনয় এই সবকিছুকে অতিক্রম করে আত্মনিবেদনের ব্রত নিয়ে যাপন করেন অন্তহীন প্রতীক্ষার প্রহর:

> লীলাময়ী করপুটে তোমাদের সবই ঝ'রে যায়—
> হাসি, জ্যোৎস্না, ব্যথা, স্মৃতি অবশিষ্ট কিছুই থাকে না।
> এ আমার অভিজ্ঞতা। পারাবতগুলি জ্যোৎস্নায়
> কখনো ওড়ে না; তবু ভালোবাসা দিতে পারি আমি। ...
>
> প্রাচীন চিত্রের মতো চিরস্থায়ী হাসি নিয়ে তুমি
> চ'লে যাবে; ক্ষত নিয়ে যন্ত্রণায় স্তব্ধ হবো আমি। (৬৫, *ফিরে এসো, চাকা*)

করুণ চিলের মতো সারাদিন ঘুরে অতিক্রান্ত হয় কবির ব্যথিত সময়। শরীরের আর্তনাদকে অতিক্রম করতেও ব্যর্থ হন তিনি। ক্ষণস্থায়ী প্রেম এবং তার আসক্তিকে অতিক্রম করে যে প্রেমের বিস্তার জীবনব্যাপী, কবি সেই জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত প্রেমের অভিসারী হতে অভিলাসী। সুতরাং স্মৃতি-ভারাতুর বিরহকাতর প্রেমিক কবি বেদনা ও যন্ত্রণাভার থেকে মুক্তি প্রত্যাশায় হার্দিক প্রেমের আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন কবিতায়:

> আমি মুগ্ধ, উড়ে গেছো; ফিরে এসো, ফিরে এসো, চাকা,
> রথ হয়ে, জয় হয়ে, চিরন্তন কাব্য হয়ে এসো।
> আমরা বিশুদ্ধ দেশে গান হবো, প্রেম হবো, অবয়বহীন
> সুর হ'য়ে লিপ্ত হবো পৃথিবীর সকল আকাশে। (৭০, *ফিরে এসো, চাকা*)

শৈশবেই কবি নিজেকে দেখেছেন কোনো নারীর চোখে, আর সেই নারী ভিন্ন অন্য কাউকে দেখবার বাসনা কবির মধ্যে লুপ্ত। যদিও 'হাসির মতোন' সেই নারী মিলিয়ে গিয়েছে, তবু তারই জন্য কবির অধীর প্রতীক্ষা। 'বালিকাকে বিদায় দেবার বহু পরে পুনরায়' দর্শন প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিজড়িত হয়ে আছে কবির শৈশব-স্মৃতি। সেই স্মৃতিকেই কবি জীবনের অমূল্য সম্পদ বিবেচনা করেছেন। প্রতীক্ষার বিরহ-ব্যথাকেও জীবনের মহৎ, মধুর দান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন কবিতায়:

> হয়েছিলো কোনোকালে একবার হীরকের চোখে
> নিজেকে বিম্বিত দেখে; তারপর আর কেন আরো
> উদ্বৃত ফুলের প্রতি তাকাবো উদ্যত বাসনায়?
> কেন মনোলীনা, কেন বলো চাকা, কী হেতু তাকাবো? (৭১, *ফিরে এসো, চাকা*)

ফিরে এসো, চাকা মূলত প্রেমের বিচ্ছেদ ও তজ্জনিত বিরহের কাব্য। কিন্তু সেই বিরহ শেষ পর্যন্ত সমর্পিত হয়েছে দেহাত্মবোধের আশ্রয়ে। বিস্মৃতার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবোধ কবির মনোলোকে বিশ্বলোক থেকে বিচ্ছিন্নতার বোধ জাগ্রত করেনি। রবীন্দ্রকাব্যে দেহকেন্দ্রিক উচ্চারণ থাকলেও প্রেম সেখানে সীমা থেকে অসীমে, দেহ থেকে দেহাতীতে উত্তীর্ণ। জীবনমৃত্যুর সীমা অতিক্রম করে রবীন্দ্রকাব্যে বিরহ হয়েছে মধুময়। জীবনানন্দ বিরহকে প্রেমের অনিবার্য পরিণাম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর কাব্য দেহচেতনার সোচ্চার প্রকাশক, সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেম আত্মরতির পর্যায়ে এবং স্মৃতিসুখের উপাদান হিসেবে বর্তমান। সুধীন্দ্রকাব্যে প্রেম দীপ্র হয়ে ওঠে দেহচেতনার তীব্র সংরাগে আর প্রেমজ বিরহে বিনয়-চিত্তে জেগে থাকে যৌনবাসনার লুপ্ত উপস্থিতি। যদিও প্রেমের কবিতাসমূহে দার্শনিকতার সমান্তরালে 'শরীরপ্রয়াসকেও বিনয় অনন্যতার সাবল্য ও সাবলীলত্বে মিলিয়েছেন আর তা এতটাই শিল্পিত যে, কখনোই তাকে অনাবশ্যক সুড়সুড়ি বলে মনে করার উপায় নেই।' (স্নিগ্ধদীপ ২০১৭: ১৫৮)

ফলত কবি অতি সহজেই উচ্চারণ করতে সক্ষম হন—'শয়নভঙ্গির মতো স্বাভাবিক, সহজ জীবন' পেতে হলে প্রয়োজন হৃদয়ের অন্তর্গত ঘ্রাণ আস্বাদন। কবি সম্পর্কের যে নতুন বিন্যাসে অগ্রসর হয়েছেন সেখানে প্রেমসম্পর্ক-সূত্রে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে শরীরী সম্পর্কের ইঙ্গিত:

> কেবল নির্ভুলভাবে সম্পর্কস্থাপন করা যায় না এখনো।
> সকল ফুলের কাছে এতো মোহময় মনে যাবার পরেও
> মানুষেরা কিন্তু মাংসরন্ধনকালীন ঘ্রাণ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। (৬, *ফিরে এসো, চাকা*)

*ফিরে এসো, চাকা*য় যে শরীরনির্ভর প্রেমার্তি প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল, পরবর্তী কাব্য *ঈশ্বরীর*-এ তার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। *ঈশ্বরীর* কাব্যে বিনয়ের প্রেম প্রথম থেকেই শরীরী। এ কাব্যে ঈশ্বরী স্বতন্ত্র এক মূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। ঈশ্বরীর নিকট কবি ভুলত্রুটির জন্যে স্বর্গ ও মর্ত্যলোকে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, আবার তার সঙ্গেই তিনি মিলিত হবার বাসনা ব্যক্ত করেন। ঈশ্বরীর সঙ্গে চিরকাল একত্র হয়ে থাকতে চেয়ে কবি নিবেদন করেন তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ। কবি উপলব্ধি করেন বৃক্ষ ও মানুষের মধ্যে সুপষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। বৃক্ষ ও মানুষ উভয়েরই বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা থাকলেও কেবল মানুষেরই আছে আত্মোপলব্ধির জগৎ। ফলত বৃক্ষের পরিবর্তে মানুষ হয়ে ওঠে তাঁর আকর্ষণের বিষয়। আর এই মানুষ বিশেষভাবে কবিকল্পিত সেই নারী যাকে কবি নাম দিয়েছেন ঈশ্বরী। এই নারীর সন্নিকটবর্তী হওয়ার বাসনা ব্যক্ত হয়েছে কবিতায়:

> বৃক্ষদের প্রতি চেয়ে মানুষের কথা মনে পড়ে।
> দেখেছি, মানুষ অর্ধ-সজীবপদার্থমাত্র, তারও
> বংশ-বৃদ্ধিকরণের ক্ষমতা রয়েছে, তবে কোনো
> আত্মা নেই; এই ভালো। তাহলে শুধু তুমি-আমি—
> আরও কাছে টেনে নাও, চিরকাল একত্রিত হয়ে থাকো, সখি। ('সর্বদা সত্য অনুরোধ', *ঈশ্বরীর*)

ঈশ্বরীর সঙ্গে কবির যে প্রণয়-সম্পর্ক তা কেবল পৃথিবী-পরিসরে পরিব্যাপ্ত নয়, বরং তাঁদের প্রণয় পৃথিবীর সীমান্তরেখা অতিক্রম করে বিস্তৃতি পায় মহাশূন্যলোকে। দেব-দেবীদের মতো ‘অসীম তারকালোকে’ প্রণয়-সম্পৃক্ত হয়ে কবি জানান ঈশ্বরীর সঙ্গে গড়ে ওঠা তাঁর মাত্রাবহুল সম্পর্ক-কথা। ঈশ্বরী কখনো কবির সখি, আবার কখনো কবি তার ‘ভৃত্য, বন্ধু, সহচর, স্বামী ও প্রণয়ী’। দ্বৈতচিন্তায় কবি কখনো কখনো নিজেকেই ঈশ্বরতুল্য বিবেচনা করেন। কবি উপলব্ধি করেন, মানুষ যেন ‘মস্তিষ্কের সুজটিল নিয়মনিচয় অনুসারে’ ‘ক্রমেই মূক থেকে মূকতর’ হয়ে উঠেছে; অথচ প্রথাগত ধর্মদেবতারা ক্রমাগত নিয়মের যথার্থতা যাচাইয়ের কাজে নিত্য নিয়োজিত। সঙ্গত কারণে কবির উপলব্ধি ‘... আমি এবং ঈশ্বরী—/ সর্বত্র বিরাজমান, বিশ্বের সকল কিছুতেই/ রূপ ও শক্তি হয়ে বিদ্যমান আছি দুজনেই’ (‘রূপ ও প্রকৃতি হয়ে’)। কবি ও ঈশ্বরীর ক্ষণিক প্রেম যখন অনন্তলোকের ব্যঞ্জনা প্রাপ্ত হয়, তখন কবির ভাবনায় সময় হয়ে আসে নিস্তব্ধপ্রায়। পরস্পর ভালোবেসে কবি, ঈশ্বরী ও সময় যেন সংহত হয় একটিমাত্র বিন্দুতে। তবে এই প্রগাঢ় উপলব্ধির পরও প্রণয়ের পথ কবির নিকট ‘পিছল’ এবং ‘বন্ধুর’। মিলন-মুহূর্তেও প্রিয়তমা এবং তার প্রেম কবির নিকট প্রতিভাত হয় ত্রিশূলী পাহাড় হিসেবে:

এই আমাদের এই চিরন্তন পিছল প্রণয়।
ত্রিশূলী পাহাড়, প্রিয়া, প্রিয়তমা ত্রিশূলী পাহাড়।
অবশেষে বহির্গত কণা কণা তীর্থযাত্রা যায়
তৃপ্ত গিরিখাত পথে অন্তরের দিকে দলে দলে;
এত ঘন প্রেমপাত আর কোন্ কারুকার্যে চলে? (‘প্রিয়তমা ত্রিশূলী পাহাড়’, *ঈশ্বরীর*)

ঈশ্বরীর কাব্যের বেশ কিছু কবিতায় প্রেম এবং তার মিলন-মুহূর্ত প্রাধান্য পেয়েছে যা পূর্ববর্তী কাব্যসমূহে ছিল অনুপস্থিত। এ কাব্যের ‘সর্বদা নিত্য অনুরোধ’, ‘আমাদের দ্বৈতচিন্তা’, ‘একটি গাধার কাহিনী’, ‘রূপ ও প্রকৃতি হয়ে’, ‘অসীম তারকালোকে’, ‘যদিও একাকী তবু’, ‘প্রিয়তমা ত্রিশূলী পাহাড়’, ‘বৃক্ষ ও হিপ্‌পকেট’, ‘আমি আর করবী কুসুম’, ‘দুটি কবিতা’, ‘আমি ঈশ্বরীর স্বামী’, ‘কালক্ষেপণের দর্শন’, ‘চিন্তার বিষয়’, ‘প্রাণে গমনের পথে’, ‘ঈশ্বরীর নিরাপত্তার জন্য’, ‘কম্পোজিশন’, ‘অভিলাষ মতো দেহ পাই’, ‘শ্বেত গোলাপের মতো তোমার শরীর’, ‘দুজনের অতি ব্যক্তিগত’, ‘এভাবেও শোয়া যায়’, ‘দ্বৈত পারিবারিকতা’, ‘প্রাগ্রসর উদ্‌গ্রীব হৃদয়’, ‘অনেক সুখের গল্প’, ‘প্রিয়তমা তোমার আমার’, ‘গালের রক্তিমা দেখে’, ‘আলোচনা করা যায়’, ‘তির্যক দৃষ্টিতে দ্যাখো’, ‘কোনো মনোভাব’, ‘আমাদের উজ্জ্বলতা’, ‘তোমার আমার মানসিক’ প্রভৃতি কবিতার কোনোটিতে প্রেমের মিলন-মুহূর্ত আবার কোনোটিতে মিলনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। জৈব বাসনার প্রকাশই মূলত এই কবিতাগুলোর কেন্দ্রকথা। শরীরী-প্রেমের এই প্রবল উপস্থিতি আরো প্রকটরূপ ধারণ করেছে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ *বাল্মীকির কবিতায়*। তিরিশের কবিরা ফ্রয়েড-লরেন্সের দেহবাদের আশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে পৃথক পথের সন্ধানী হয়েছেন। বিনয় একদা হাংরি জেনারেশনের দলভুক্ত হয়েও পরবর্তীকালে সেখান থেকে সরে আসেন। কবিতায় দেহ-কেন্দ্রিকতাকে প্রাধান্যের ক্ষেত্রে বিনয় তাঁর সমকালীন কবিদের মধ্যে ছিলেন বিশেষভাবে অগ্রণী। এমনকি *ঈশ্বরীর, বাল্মীকির কবিতা* প্রভৃতি কাব্যে যে দেহবাদের প্রচার দেখা যায় তা তিরিশের কবিদের চেয়েও অনেক বেশি ব্যঞ্জনাময়। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় একটি দৃষ্টান্ত:

প্রলোভন, প্রয়োজন পূর্বাহ্ণে বিদিত আছে ব'লে
দ্যাখো, সময়োপযোগী ব্যবস্থাপনার ফলস্বরূপে—
আমরা মিলিত হই তারার আলোর সুবিস্তারে,
আমরা মিলিত হই রোমশ গভীর অন্ধকারে,
আমরা মিলিত হই ওষ্ঠাধরসুলভ আলোকে। ('আমি ঈশ্বরীর স্বামী', *ঈশ্বরীর*)

সহস্র বছরের ক্লান্তি আর দীর্ঘশ্বাস নিয়ে পথচলা জীবনানন্দের কাছে মুক্তির আলোকিত আশ্রয় প্রেম। তাঁর প্রেম কেবল দেহসর্বস্ব কিংবা ভাব-সর্বস্বতায় পর্যবসিত হয়নি। অনুভবের বৈচিত্র্য ও গভীরতা নিয়ে যে প্রেমকে তিনি অবলোকন করেছেন তা শেষ পর্যন্ত কবির জন্য শান্তি ও নিশ্চিতির এক নিরাপদ আশ্রয়ভূমি। প্রেমের অভিজ্ঞতাজাত বৈচিত্র্যে বিনয় স্বতন্ত্র। তাঁর প্রেম ক্রমশ ভোগবাদিতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। তবে বিনয়ের মানসিক অসুস্থতা তাঁর এই দেহকেন্দ্রিক প্রেমের উচ্চারণের বড় কারণ হিসেবে মনে করা হয়।

চার

রবীন্দ্রকাব্যে সর্বপ্রথম মধ্যযুগীয় প্রয়োগ-রীতির আবেষ্টনী ভেঙে আধুনিক সংবেদনশীলতায় উপস্থাপিত হয়েছে প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর সংস্কার-বিশ্বাস এবং ঔপনিষদিক মূল্যবোধ ক্রিয়াশীল ছিল। রবীন্দ্রানুসারী কবিদের মধ্যে কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩-১৯৭০), করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) নিসর্গ বর্ণনামূলক কবিতায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। কল্পনার আবেগময় আবেষ্টনী সৃষ্টির জন্যে তাঁদের কবিতায় প্রকৃতি-বর্ণনা ভাবময় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রোত্তরকালে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম কবিতায় নিছক প্রকৃতি বর্ণনার পরিবর্তে প্রকৃতিকে কবিতার অনুষঙ্গ করে তোলেন। আধুনিকতাবাদী কবিদের কবিতায় প্রকৃতি-বর্ণনার পরিবর্তে প্রাধান্য পায় প্রকৃতি-বলয়িত চিত্রকল্পের প্রয়োগ। এই কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকৃতি-প্রয়োগের উৎকৃষ্ট নিদর্শন লক্ষ করা যায়। বিনয় মজুমদার বহুমাত্রিকতায় প্রকৃতিকে উপস্থাপন করেছেন কবিতায়। *নক্ষত্রের আলোয়, ফিরে এসো, চাকা, অধিকন্তু, অঘ্রানের অনুভূতিমালা* প্রভৃতি কাব্যে প্রকৃতি উপস্থাপিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা সম্পাতে। এছাড়া স্বনির্বাসিত জীবনে বিনয়ের এক দীর্ঘ সময়ের অবলম্বন হয়েছে প্রকৃতি। প্রথম পর্বের কাব্যসমূহে প্রকৃতিপ্রয়োগ শিল্পোত্তীর্ণ হলেও শেষ পর্বের কাব্যসমূহে তা হয়ে উঠেছে নিছক বর্ণনাধর্মী কাব্যপ্রয়াসমাত্র।

বিনয়ের *নক্ষত্রের আলোয়* কাব্যে যে নিসর্গচিত্র বিধৃত হয়েছে তা কোনো ইতিবাচক জীবনভাবনায় বিশিষ্ট হয়ে ওঠেনি। কাব্যটিতে নক্ষত্রের আলোকে কবি দেখেছেন বিপন্নতার আলো হিসেবে। যে আলোয় কবিহৃদয় আক্রান্ত হয় বিমর্ষ অসুখে। কাব্যান্তর্গত 'নক্ষত্রের আলোয়' এবং 'এই আকাঙ্ক্ষা' কবিতা দুটিতে প্রকৃতিচিত্রের যে প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়, তাতে নক্ষত্র হয়ে ওঠে কবির বেদনাময় জীবনভাষ্যের পরিপূরক। জ্যোৎস্নাবিহীন 'নক্ষত্রের আলোয়' কবিমনে আশঙ্কা জাগে সমুদ্রজলে ডুবে যেতে পারে বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠের আঁধারের মুখে লেগে থাকা 'বিপন্ন আলোয়' কবিহৃদয় আক্রান্ত হয় 'বিমর্ষ অসুখে'। চাঁদহীন রাতে যে নক্ষত্রেরা জ্বলে ওঠে সুদূর আকাশে, সেখানেও প্রতিফলিত হয় নীল বেদনার প্রতিচ্ছবি। 'এই

আকাঙ্ক্ষায়' কবিতায় ব্যক্তিগত দুঃখবোধের সূত্রে প্রকৃতি কবির নিকট প্রতিভাত হয় বিমর্ষতার প্রতীকে আর পৃথিবীকে মনে হয় অনুর্বর, জীবনধারণের অনুপযোগী কোনো স্থান। *নক্ষত্রের আলোয়* কাব্যে 'নক্ষত্র' শব্দটির বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিমনের ক্লান্তি ও নৈরাশ্যের বেদনাকে ঘনীভূত করে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়:

ক. তুমি যেন চ'লে যাও অতি দূর, অমলিন নক্ষত্রের নীলে;
আমি যেন ধীর হিম, বিশাল প্রান্তরে ব'সে ব'সে
সমুদ্রের কথা ভাবি, অনুভব করি তুমি কতো কাছে ছিলে! ('চিরদিন একাএকা', *নক্ষত্রের আলোয়*)

খ. অন্ধকারে ব'সে আছি, চারিদিকে প্রান্তরের বিধুর বাতাস।
নক্ষত্রের দিকে চেয়ে বুকে জমে জীবনের সব দীর্ঘশ্বাস
আমি একা পড়ে আছি, তুমি আছো আকাশের সুনীল অতলে। ('চিরদিন একাএকা', *নক্ষত্রের আলোয়*)

গ. হৃদয় বিস্মিত এক বিমর্ষ অসুখে।
চাঁদ নেই দেখি দূরে নক্ষত্রেরা জ্বলে।
যে নক্ষত্র নীল হয়ে আছে, দেখি তাকে। ('নক্ষত্রের আলোয়', *নক্ষত্রের আলোয়*)

প্রথম কবিতাংশে নক্ষত্রের নীল আলোয় ব্যক্ত হয় কবি-প্রিয়ার বিদায় বার্তা, দ্বিতীয় কবিতাংশে নক্ষত্রের দিকে লক্ষ করে নিঃসঙ্গ কবিমনের দীর্ঘশ্বাস ঘনীভূত হয়, আর তৃতীয় কবিতাংশে বিমর্ষ অসুখে বিস্মিত কবিহৃদয় নক্ষত্রের নীল আলোয় যাপন করে বিরহকাতর সময়। বিনয়ের কবিতায় প্রকৃতি বর্ণনার যে বিশেষ প্রয়োগ সহজেই উপলব্ধি করা যায় তা হলো: নিছক বর্ণনার পরিবর্তে তিনি নিসর্গলোকের রূপ-রীতি বিষয়ক তথ্যাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে কবিতাকে একই সঙ্গে তথ্য ও রসসমৃদ্ধ করে তোলেন। ঋতু পরিবর্তনের পরম্পরায় প্রকৃতি-অন্তর্গত জৈবজীবনের যে পরিবর্তন সূচিত হয় তা কবিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। *গায়ত্রীকে* কাব্যের ৯ সংখ্যক কবিতায় নিসর্গলোকের বর্ণনায় পরিবর্তমান প্রকৃতি ও তার সারধর্ম অক্ষুণ্ন রেখে কবি তাকে শৈল্পিক অভিনিবেশ-যোগে উপস্থাপন করেন এভাবে:

চতুর্দিকে অগণন সরস পাতার মাঝে থেকে
শিরীষ গাছের ফল তৃষ্ণায় বিশুষ্ক হয়ে যায়।
দৃষ্টির অতীত দেশে শীতকালে আত্মরক্ষা হেতু
খরগোশগুলি সব ধূসরাভ রোম ত্যাগ ক'রে
বরফের মতো সাদা রোমের আড়ালে বেঁচে থাকে।
লেবু গাছ থেকে কোনো শাখাকে নুইয়ে নিচু ক'রে
তার মাঝখানে যদি মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়
তাহলে সেখানে ফের মূলের উদ্‌গম হয়ে যায়।
আরেকটি পৃথক গাছ এই ভাবে জন্ম পেয়ে থাকে। (৯, *গায়ত্রীকে*)

বিনয়ের এই বর্ণনা নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ ও অভিনব। প্রথম পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে শিরীষ ফলের বিশুষ্ক অবস্থা নির্দেশিত হয়েছে। অতঃপর ঋতু পরিবর্তনকালে প্রকৃতিতে বসবাসরত প্রাণিকুলের স্বভাববৈশিষ্ট্য উন্মোচিত হয়েছে খরগোশের পরিবর্তিত জীবনাচরণ প্রসঙ্গে। সর্বশেষে উপস্থাপিত হয়েছে একটি লেবু গাছ থেকে নতুন চারা তৈরির ব্যবহারিক কৌশল। প্রকৃতির এরূপ তথ্যসমৃদ্ধ বর্ণনাকৌশল বিনয়ের আগে কিংবা পরে আর কোনো বাঙালি কবির কবিতায় দেখা যায় না। তাঁর কবিতায় এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যেখানে বিনয় কবিতার মোড়কে তথ্যের সমাবেশ ঘটান। প্রসঙ্গিক বিবেচনায় আরো কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যাক:

ক. অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে জানা গেছে, সকলে জেনেছে—
ডালিয়া ফুলের মধ্যে চিনির আধিক্য বিদ্যমান। (১০, *গায়ত্রীকে*)

খ. রাফ্লেসিয়া গাছ রূপে এতটা মাংসের মতো যাতে
মাছিরা ভুলবশত তাতে এসে ভিড় ক’রে থাকে।
জগতের সবচেয়ে বড় ফুল এই গাছে হয়,
তবুও কৃত্রিমভাবে অন্য গাছ থেকে খাদ্য নেয়। (১১, *গায়ত্রীকে*)

বাংলা কবিতায় বিনয়ের বিশিষ্টতা এই যে, তিনি অনুভূতিপ্রধান বাংলা কবিতাকে বিজ্ঞানমনস্ক কবিতায় রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রকৃতির নিবিড় অনুভবময় উপলব্ধির সমান্তরালে বিজ্ঞানবোধও যে কাব্যের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হতে পারে এই সত্য বিনয়ের মাধ্যমেই বাংলা কাব্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের শৈল্পিক বিন্যাসে বিনয়-নির্মিত একটি কবিতাংশ এ পর্বে আমাদের বিচার্য:

হে আলেখ্য, অপচয় চিরকাল পৃথিবীতে আছে;
এই যে অমেয় জল, মেঘে মেঘে তনুভূত জল—
এর কতোটুকু আর ফসলের দেহে আসে বলো?
ফসলের ঋতুতেও অধিকাংশ শুষে নেয় মাটি।
তবু কি আশ্চর্য, দ্যাখো, উপবিষ্ট মশা উড়ে গেলে
তার এই উড়ে যাওয়া ঈষৎ সংগীতময় হয়। (৬, *ফিরে এসো, চাকা*)

আলোচ্য কবিতাংশে কবি প্রকৃতিলোকে ঘটে চলা একটি বৈজ্ঞানিক সত্যকে কাব্যময় ভাব ও ভাষায় পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। ফসলের জন্য জল আবশ্যক হলেও মেঘমালা থেকে বর্ষিত জল সর্বাংশে ফসলের দেহে প্রবিষ্ট হয় না বরং তার বেশির ভাগই শোষণ করে মাটি এবং তা শেষ পর্যন্ত ভূগর্ভে চলে যায়। প্রকৃতির এই নিত্যনিয়ম বিনয়ের কাব্যপ্রতিভার গুণেই শিল্পিত হয়। আবার উপবিষ্ট মশার উড়ে চলার শব্দে যে সংগীতময় ধ্বনির সৃষ্টি হয় তার শৈল্পিক বিন্যাসে ক্রিয়াশীল থাকে কবির সংবেদনশীল কবিমন। এরূপ আরো একটি দৃষ্টান্ত:

দূরাকাশে, বহিঃশূন্যে ভ্রাম্যমাণ বস্তুপিণ্ডগুলি
বায়ুমণ্ডলের মধ্যে এসেই উজ্জ্বলভাবে জ্বলে।
নিঃসঙ্গ রুগ্‌ণের কাছে কপালে

শীতল হাত আশ্চর্য প্রশান্তি নিয়ে আসে।
পৃথিবীর আকর্ষণে ফুলগুলি নুয়ে পড়ে, ঝ'রে প'ড়ে যায়।
কিন্তু দ্যাখো, পাখিগুলি স্বেচ্ছাধীন নেমে পুনরায় উড়ে যেতে পারে। (৬, *গায়ত্রীকে*)

মহাশূন্য থেকে আগত যেকোনো বস্তুপিণ্ড পৃথিবীর নিকটবর্তী হলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণজনিত বলের ফলে বস্তুটি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশমুহূর্তে ঘর্ষণজনিত কারণে দূর থেকেও তা অতি উজ্জ্বলরূপে দৃশ্যমান হয়—পদার্থবিদ্যার এই তাত্ত্বিক বিষয়ের কাব্যবিন্যাসের ফলে বিনয়কাব্যের বিষয়-পরিধি যেমন প্রসারিত হয়, তেমনি পাঠকচিত্তে সৃষ্টি হয় ব্যঞ্জনাময় অভিনিবেশ। আবার কবিতাংশের শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে মাধ্যাকর্ষণ বলের আকর্ষণে ফুলের মাটিতে ঝরে পড়ার এবং সেই শক্তিকে অগ্রাহ্য করে পাখির উড়ে চলার মাধ্যমে পৃথিবীর বৈচিত্র্যময় প্রাণশক্তির জয় ঘোষিত হয়।

বিনয় মজুমদারের প্রকৃতি বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি বিজ্ঞানময়। এই দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে তাঁর কবিতা পাঠকের সম্মুখে এক নতুন বিস্ময়রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই বিজ্ঞানমুখিতার ফলে অন্য সব কবির সঙ্গে বিনয়ের কাব্য-মেজাজের একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় জীবনানন্দ নক্ষত্রকে দেখেন অনুভূতির অভিজ্ঞানের আলোকে। তাঁর কবিতায় 'বিজ্ঞানের ক্লান্ত নক্ষত্রেরা নিভে যায়'। আর জীবনানন্দের উত্তরসাধক বিনয় লক্ষ করেন: 'নিকটবর্তী এবং উজ্জ্বলতম তারাগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে/ সব গ্রহ, তারা নয়, তাপহীন আলোহীন গ্রহ' ('শিশুকালে শুনেছি যে')। বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে বিনয় যে মাত্রাজ্ঞানে কবিতায় সন্নিবিষ্ট করেন তাতে বলা যায়, কবিতার প্রয়োজনে বিনয় বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেননি বরং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসমূহ নান্দনিক মোড়কে কবিতায় উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ বিজ্ঞান যেখানে বিনয়ের লক্ষ্য সেখানে কবিতা উপলক্ষ্য মাত্র। তাঁর কবিতায় 'বিজ্ঞানবোধ যেন দারুচিনির সুঘ্রাণে জেগে থাকে।' (আর্যনীল ২০২১: ২৪২)। আর এভাবে বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিসন্ধানে গড়ে ওঠে বিনয়ের কবিতার কাঠামো।

বিনয় নিজেকে প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন নয়, বরং পৃথিবীর বৃহত্তর জীববৈচিত্র্যের অংশ হিসেবে উপলব্ধি করেন। ফলত বিশ্বপ্রকৃতির জীবন হয়ে ওঠে বিনয়ের নিজেরও জীবন। এ কারণে প্রকৃতিভাষ্য তাঁর দৃষ্টিতে আত্মভাষ্যেরই নামান্তর:

পৃথিবীর ঘাস, মাটি, মানুষ, পশু ও পাখি—সবার জীবনী লেখা হলে
আমার একার আর আলাদা জীবনী লেখা না-হলেও চ'লে যেতো বেশ।
আমার সকল ব্যথা প্রস্তাব প্রয়াস তবু সবই লিপিবদ্ধ থেকে যেতো।
তার মানে মানুষের, বস্তুদের, প্রাণীদের জীবন প্রকৃতপক্ষে পৃথক পৃথক
অসংখ্য জীবন নয়, সব একত্রিত হয়ে একটি জীবন মোটে; ফলে
আমি যে আলেখ্য আঁকি তা বিশ্বের সকলের যৌথ সৃষ্টি এই সব ছবি। ('এ জীবনে', *বাল্মীকির কবিতা*)

বিনয়-কাব্যে নিসর্গ পরিবেশনার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হয় তাঁর *অঘ্রানের অনুভূতিমালায়*। *ফিরে এসো, চাকার* পর এ কাব্যটি বিনয় কাব্যভুবনে বিশিষ্টতার দাবিদার। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের

(১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের) অঘ্রান মাসে কাব্যটি রচিত হয়। মাত্র এক মাসের প্রয়াসে রচিত কাব্যটি বিনয়ের কবিত্বশক্তির পরিচয়ের প্রমাণ বহন করে। *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* রচিত হয়েছে দমদমের গোরাবাজারে দিদির বাড়িতে বিনয়ের অবস্থানকালে। দমদমের যে অঞ্চলে বিনয় থাকতেন সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি বিনয়কে প্রকৃতি বর্ণনাধর্মী কবিতা লিখতে প্রাণিত করেছে। *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* কাব্য সম্পর্কে বিনয়ের বক্তব্য ছিল এরূপ:

> এ-অবধি আমি কোনোদিন নিসর্গবর্ণনামূলক কবিতা লিখিনি। অধিকাংশই ঘটনার বিবৃতি লিখেছি। অতঃপর আমায় কলকতার শহরতলীতে থাকতে থাকতে হয় যাকে প্রায় গ্রাম বলা যায়। চারদিকে নানা গাছপালা লতাপাতা ছিল, ছোটবড় পুকুর ছিল। ভাবলাম প্রকৃতির বর্ণনা লেখার চেষ্টা করা যাক। এক মাসের ভিতরে খুব দীর্ঘ ছ'টি কবিতা লিখলাম। ... বইয়ের নাম দিলাম 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'। (বিনয় ২০১৭: ২৫)

বিনয়ের বক্তব্যানুসারে *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* তাঁর 'নিকটতম লেখা'; তাঁর 'একাকিত্ব নিয়ে' লেখা। বাংলা ভাষায় দীর্ঘতম পয়ার ছন্দে লেখা এ কাব্যে বিনয়ের অন্তর্গত একাকিত্বের ভাষ্য যেমন স্পষ্ট তেমনি প্রকৃতিলোক ও জীবন সম্পর্কেও কাব্যটি গভীর অনুভূতি ও উপলব্ধির প্রকাশক। নিসর্গলোকের একরাশ সত্যকে কাব্যিক সৌকর্যে উপস্থাপনের পাশাপাশি এ কাব্যে কবি মানসনেত্রে এক বিশ্বলোককে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর মানসলোকের বিশ্ব কাব্যটিতে বাস্তবের বিশ্ব হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। *অঘ্রানের অনুভূতিমালায়* দেশ-কাল বিচ্ছিন্ন নিসর্গের এক নিবিড় অনুভূতিমাল্য রচনার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় কাব্যটির ১ সংখ্যক কবিতার অংশবিশেষ:

> সব-কিছু চুপচাপ নীরব, নিথর হয়ে শেষে হেসে ফ্যালে—
> এই হলো ভোরবেলা, আসল সকালবেলা, যদিও আঁধার।
> এরা পরে মিশে যায় নয়নতারার সাথে আকাশের তারা,
> গাঁদা ফুলগুলি থেকে মধু যেন ধ্বনিময় কথা হয়ে ওঠে,
> কথা ব'লে যেতে থাকে, নানাকথা বলে যায় আঁধারের সাথে। (১, *অঘ্রানের অনুভূতিমালা*)

অঘ্রানের অনুভূতিমালায় কবি কোনো রোমান্টিক মানুষ বা প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে তার শোভা বর্ণনা করেননি। এ কাব্যে কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর নেই; 'বরং চরাচরের কণ্ঠস্বরেই আমরা মাঝে মাঝে শুনতে পাই মানুষের কণ্ঠস্বর' (রবিশংকর ২০২১: ৫২০)। তবে বিনয়ের *ঈশ্বরীর* এবং *বাল্মীকির কবিতা* যে শরীরনির্ভর বক্তব্য প্রকাশের জন্য সমালোচিত, ঠিক একই কারণে *অঘ্রানের অনুভূতিমালাও* সমালোচক মহলে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এই কাব্যটিকে বিনয় 'ধর্মগ্রন্থে'র মর্যাদা দিলেও জনৈক সমালোচকের মতে, 'এই কবিতাগুলিতে নিসর্গ বর্ণনার মোড়কে নারীদেহ, বিশেষত নারী যৌনাঙ্গ, পুরুষ যৌনাঙ্গ, নারীপুরুষের যৌনক্রিড়া ও যৌনমিলনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আর এসবের ফাঁকে ফাঁকে অতীব দক্ষতায় জুড়ে দেওয়া হয়েছে জগৎ, জীবন ও নানা বিষয়ে ভাবিয়ে তোলার মতো নানা দার্শনিক অনুভব।' (শ্রীতরুণ ২০২১: ২৩৯)

বিনয়ের শেষপর্বের কাব্যসমূহে যে নিসর্গচিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তা অতিশয় সরল। এ পর্বে রচিত কাব্যসমূহে প্রকৃতি যেন জীবনের সমান্তরাল হয়ে পরিবেশিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। *আমাদের বাগানে* কাব্যান্তর্গত একটি কবিতায় রাত্রিকালীন নিসর্গলোকের বর্ণনা এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে:

> বাইরে তাকিয়ে আমি দেখলাম আকাশের চাঁদ।
> আজকে পূর্ণিমা তিথি, দুটি সরু সুপুরি গাছের
> ফাঁকে দেখলাম পূর্ণ চাঁদ সোনালি রঙের।
> চারিপাশ উদ্ভাসিত জ্যোৎস্নায়, পুকুরের জল
> শ্বেত বর্ণ দেখা যায়, জলের চেয়েও শ্বেত জলের উপরে ভাসমান
> শাপলার পাতাগুলি; ('দৃষ্টি ক্ষীণ হলে', *আমাদের বাগানে*)

কাব্যিক দ্যোতনা সৃষ্টির পরিবর্তে বর্ণনাত্মক রীতির আশ্রয়ে পরিপার্শ্বের অবিকল উপস্থাপনা অন্তিম পর্যায়ের বিনয়-কাব্যের বিশিষ্টতা।

বাংলা কবিতার সহস্রাব্দের পথচলায় বিনয় মজুমদারের আবির্ভাব অতি স্বল্পকালের। তদুপরি এই স্বল্পসময়ে তিনি রেখেছেন স্মরণযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর। জীবনময় কাঁটার বোঝা বহন করে তিনি রক্তাক্ত হয়েছেন সত্য, কিন্তু কবিতাঙ্গনে নির্মাণ করেছেন শিল্পিত পুষ্পোদ্যান। প্রেম ও নিসর্গের শৈল্পিক বিন্যাসে তিনি কবিতাকে করে তুলেছেন মেধা ও মননের শিল্পভাষ্য। শ্রমসাধ্য অনুশীলন এবং পরিশীলনের মধ্য দিয়ে বিনয়ের কবিতা এমন একটি স্তরে উন্নীত হয়েছে যেখানে তা কেবল বিনোদনের সামগ্রী নয়, দর্শন ও বিজ্ঞানের অভিনিবেশ-প্রত্যাশী। ফলত, জীবনানন্দ-পরবর্তী আধুনিক কাব্যসমীক্ষার অন্যতম প্রধান সারথি বিনয়কে অস্বীকার করে আধুনিক কবিযশঃপ্রার্থীর কাব্যযাত্রা দুঃসাধ্য।

টীকা

১. বিনয় মজুমদারের প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয় বিংশ শতব্দীর পঞ্চাশের দশকে (*নক্ষত্রের আলোয়* ১৯৫৮)। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার সূত্রানুযায়ী বিনয়কে সহজেই পঞ্চাশের কবি হিসেবে শনাক্ত যায়। 'কিন্তু যে বইয়ের সূত্রে বিনয় মজুমদার হয়ে উঠলেন; বিনয় মজুমদার; সেই *গায়ত্রীকে* (১৯৬১) বা *ফিরে এসো, চাকা* (১৯৬২) বা *আমার ঈশ্বরীকে* (১৯৬৪)—যে নামেই ডাকি না কেন, সেগুলির প্রকাশ তো ছয়ের দশকে।' (আকাশ ২০১২: ১৫২)

২. *নক্ষত্রের আলোয়* গ্রন্থ সম্পর্কে বিনয় মজুমদার মন্তব্য করেছেন: 'বই ছাপা হয়ে বেরোলো। মোটা ষাট পাউন্ড অ্যান্টিক কাগজে ছাপা। জানাশোনা লোকদের কয়েকজনকে দিলাম পড়তে। কিন্তু কেউ আমার কবিতা সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য সুরু করলো না, প্রশংসাও করলো না। দেবকুমারবাবু নিশ্চয়ই বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায়ও দিয়েছিলেন। কেউ ভালো ক'রে রিভিউও করলো না। সব চুপচাপ, যেন আমার বই প্রকাশিত হয়নি। এ বইয়ের নাম 'নক্ষত্রের আলোয়'।' (বিনয় ২০১৭: ১৯)

৩. বিনয় মজুমদার তাঁর কাব্যপ্রচেষ্টা সম্পর্কে জানিয়েছেন: '১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের একেবারে গোড়ার

দিকে আমি স্থির করলাম সর্বান্তকরণে কবিতাই লিখি। চাকুরি আপাতত থাক। গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চ'লে গেলাম। সকালে জাগরণ থেকে শয়ন পর্যন্ত সারাক্ষণ কবিতাই ভাবতাম।' (বিনয় ২০১৭: ২০)

৪. কাব্যসৃষ্টির ব্যাপারে বিনয় মজুমদার তাঁর কালের অন্য সব কবির চেয়ে ছিলেন ভিন্ন মনোভাবসম্পন্ন: 'আমাদের সমবয়সীদের মধ্যে বিনয়ই কবিতার জন্য বেশি ঝুঁকি নিয়েছে। আমাদের অনেক পিছুটান ছিল, বাড়ির কথা চিন্তা করতে হয়েছে, জীবিকার জন্য খোঁজাখুঁজি ছিল, ব্যক্তিগত কিছু শখ মেটাবারও ব্যাপার ছিল, কিন্তু বিনয় ঝাঁপ দিয়েছে সবকিছু ভুলে। ভালো ছাত্র ছিল বিনয়, তার জন্য জীবিকার পথ প্রশস্ত ছিল, কিন্তু সে কিছু তোয়াক্কাই করেনি।' (সুনীল ২০০৬: ৫)

৫. শক্তি চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন: বিনয়ের কবিতায় 'ব্যক্তিগত প্রার্থনা ও প্রত্যাখ্যানের তেমন নির্লিপ্ততা নেই যত আছে অন্যান্য বস্তু বর্ণনা করার সময়—যেসব বস্তুর মধ্যে অগণ্য সত্য ও বৈজ্ঞানিক বিচার লিপিবদ্ধ করা, মনে হয়, বিনয়ের কবিতার একরূপ বিশিষ্ট নিয়ম। আমি এমন ধরনের বৈজ্ঞানিক সত্যকে সরাসরি কবিতার মধ্যে হৃদয়গ্রাহী এবং পরাস্ত ভঙ্গিতে বসিয়ে দেওয়া বাংলা কেন নানা সময়ের প্রকৃত ইংরেজি বা বিদেশি কবিতাতেও পড়িনি কিংবা আমার পাঠ অতি অল্প।' (শক্তি ২০২১: ১২৭)

৬. কাব্যের বিষয়সন্ধান সম্পর্কিত আলোচনায় সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'বিশ্বের সেই আদিম উর্বরতা আজ আর নেই। এখন সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে কাব্যের বীজ সংগ্রহ না করলে কাব্যের কল্পতরু জন্মায় না।' (সুধীন্দ্রনাথ ১৩৬৪: ৩৬)

৭. পঞ্চাশের দশকের কাব্যপ্রবণতা প্রসঙ্গে বিনয়-ভাষ্যে যে বক্তব্য পাওয়া যায় তা এরূপ: 'আমি লিখেছি আমাকে নিয়ে ...। সবই আমার দিনপঞ্জি। ... আসলে পঞ্চাশের কবিরা প্রায় সবাই আত্মজীবনীমূলক কবিতা লিখেছে। শুধুমাত্র নিজেদের নিয়ে লেখা। এটা একটা ট্রেন্ড বলা যেতে পারে। কেননা এর আগে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা লিখেছেন। জীবনানন্দ লিখেছেন, নজরুল লিখেছেন। পঞ্চাশের পরেও বিভিন্ন কবিরা লিখেছেন। কিন্তু পঞ্চাশের প্রায় সবাই নিজেদের নিয়ে লিখেছেন।' (বিনয় ২০০৬: ৩৯)

৮. গায়ত্রী চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল কি না এমন প্রশ্নে বিনয়ের বক্তব্য: 'কাউকে না কাউকে নিয়ে তো লিখতে হয়—আমগাছ, কাঁঠালগাছ, রজনীগন্ধা নিয়ে কি চিরকাল লেখা যায়?' (বিনয় ২০১৬: ২৭)

সহায়কপঞ্জি

আকাশ বিশ্বাস (২০১২)। *পঞ্চাশের প্রবণতা ও বিনয় মজুমদার*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

আর্যনীল মুখোপাধ্যায় (২০২১)। 'আমাদের জ্ঞানদণ্ডে এক প্রান্ত শুদ্ধতম গণিত ... আর অন্য প্রান্ত ... কবিতা', *এক আশ্চর্য ফুল বিনয় মজুমদার* (এহসান হায়দার ও সিগ্ধদীপ চক্রবর্তী সম্পাদিত)। ঢাকা: আশ্রয় প্রকাশন।

এহসান হায়দার ও স্নিগ্ধদীপ চক্রবর্তী (২০২১)। *এক আশ্চর্য ফুল বিনয় মজুমদার*। ঢাকা: আশ্রয় প্রকাশন।

জয় গোস্বামী (২০২১)। 'বেদনার আলো', *এক আশ্চর্য ফুল বিনয় মজুমদার* (এহসান হায়দার ও সিগ্ধদীপ চক্রবর্তী সম্পাদিত)। ঢাকা: আশ্রয় প্রকাশন।

জ্যোতির্ময় দত্ত (২০১৭)। *কবিতার শহীদ ও অন্যান্য*। কলকাতা: প্রতিভাস।

পিনাকেশ সরকার (২০১২)। *কবির কবিতা কবির গদ্য*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

বিজয় সিংহ (২০২১)। 'বিনয় মজুমদারের আরশিনগর', *এক আশ্চর্য ফুল বিনয় মজুমদার* (এহসান হায়দার ও সিগ্ধদীপ চক্রবর্তী সম্পাদিত)। ঢাকা: আশ্রয় প্রকাশন।

বিনয় মজুমদার (২০০৬)। *কাব্যসমগ্র* প্রথম খণ্ড। কলকাতা: প্রতিভাস।

বিনয় মজুমদার (২০১৭)। *কবিতা সমগ্র*। ঢাকা: কবি প্রকাশন।

বিনয় মজুমদার (২০১৬)। *নির্বাচিত সাক্ষাৎকার*। ঢাকা: কবি প্রকাশন।

মাসুদুজ্জামান (১৯৯৩)। *বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কবিতা: তুলনামূলক ধারা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

রবিশংকর বল (২০২১)। 'জননের প্রকৃষ্ট সময়', *এক আশ্চর্য ফুল বিনয় মজুমদার* (এহসান হায়দার ও সিগ্ধদীপ চক্রবর্তী সম্পাদিত)। ঢাকা: আশ্রয় প্রকাশন।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় (২০২১)। 'কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব', *এক আশ্চর্য ফুল বিনয় মজুমদার* (এহসান হায়দার ও সিগ্ধদীপ চক্রবর্তী সম্পাদিত)। ঢাকা: আশ্রয় প্রকাশন।

শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০২১)। 'বিনয় মজুমদারের কবিতাতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয়', *এক আশ্চর্য ফুল বিনয় মজুমদার* (এহসান হায়দার ও সিগ্ধদীপ চক্রবর্তী সম্পাদিত)। ঢাকা: আশ্রয় প্রকাশন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৩৬৪)। *স্বগত*। ঢাকা: সিগনেট প্রেস।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (২০০৬)। 'প্রথম সংস্করণের ভূমিকা', *বিনয় মজুমদারের ডায়েরি* (অজয় নাগ ও কমল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)। কলকাতা: শিলীন্ধ্র প্রকাশন।

স্নিগ্ধদীপ চক্রবর্তী (২০১৭)। *বিনয় মজুমদার: জীবন ও সাহিত্য*। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়: পিএইচডি অভিসন্দর্ভ।